বন্যা আহমেদ এবং ডারউইনের বিবর্তনবাদ

- - অনন্ত বিজয় দাশ- -

ananta@inbox.com

[ডারউইন দিবস-২০০৭ উপলক্ষ্যে লিখিত]

(১)

রফিদা আহমেদ বন্যা। মুক্তমনা'য় বন্যা আহমেদ নামেই পরিচিত এবং আন্তর্জালে অতি পরিচিত একজন লেখক। দীর্ঘদিন ধরেই বিজ্ঞানের নানা বিষয়, বিশেষ করে বিবর্তনের মতো জটিল বিষয়কে প্রাণবন্ত শব্দে মাতৃভাষায় নান্দনিক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করে লিখে চলছেন। এই লেখা শেষ করে নিয়ে আসার মুহূর্তে জানতে পারলাম, অবসর প্রকাশনী থেকে এবছর মহান একুশে বই মেলায় সদ্য (১২ই ফেব্রুয়ারি) প্রকাশিত হয়েছে। আমি তাঁর এই দীর্ঘসময়ের পরিশ্রমলব্ধ উদ্যোগকে কৃতজ্ঞচিত্তে সম্মান জ্ঞাপন করছি এবং প্রকাশিত পুস্তকের বিপুল প্রচার কামনা করি।

রফিদা আহমেদ বন্যাকে বন্যাদি, বন্যাআপা- দুটোই ডাকি, যখন যা ইচ্ছে হয়। আবার মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে, বিবর্তনদিদি বলি; প্রথম দিকে বিবর্তনদিদি ডাকলে রাগ করতেন, এখন আর করেন না!! ডাকতে ডাকতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন বোধহয়!! (তাই বলে পাঠক, আপনারা আবার বিবর্তনদিদি ডাকতে যাবেন না, তাহলে আমার খবর আছে কিন্তু!!) বন্যা আপার সাথে পরিচয় ঠিক কখন হয়েছে, সঠিক সন-তারিখসহ মনে নেই । আঙুলে গুনে হিসেব করে দেখেছি, বেশি দিনের নয়। ২০০৫ সালের জানুয়ারি মাসের (অথবা ২০০৪ এর ডিসেম্বর হবে, ঠিকঠাক মনে করতে পারছি না) কোন এক সন্ধ্যায় ইয়াহু ম্যাসেঞ্জারে হঠাৎ করেই বন্যাদির সাথে আলাপ। আমিই প্রথম বন্যাদিকে ম্যাসেঞ্জারে নক করলাম। প্রথম দিনের প্রথম পরিচয়েই জানালেন, I am (..!!..) years old and ...etc…etc!! আমি অবশ্য বয়স জিজ্ঞেস করিনি, তাই একটু অবাকই হলাম। মফস্বলে থাকি, ইন্টারনেট কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা জানি না (**এখনও না**), চ্যাট করার জন্য টাইপ করতে গিয়ে অক্ষর খুঁজে পাই না- ইত্যাদি শত ঝামেলার মাঝে নেটের সব ব্যবহারকারীদের সমবয়সীই ভাবতাম। কিন্তু বয়স জানার পর একটু ধাক্কাই খেলাম। সমবয়সী হলে, না হয়, হাই-হ্যালো-বাই বলে কথা শেষ করা যায়; কিন্তু আমার থেকে একযুগ বড় বয়োজ্যেষ্ঠর সাথে কী বলব, কী জিজ্ঞেস করবো, কীভাবে উত্তর দিব তাই ভেবে পাচ্ছিলাম না! প্রথম প্রথম এ নিয়ে অস্বস্তিবোধ করতাম, পরে আস্তে আস্তে এই অস্বস্তিবোধ এমনিতেই কেটে গেল। এরপর থেকে রোজই কথা হত ম্যাসেঞ্জারে। হিসেব করলে, গত দুই বছরে বন্যাআপার সঙ্গে দেখা হয়েছে মাত্র একটিবার আর কথা হয়েছে, দশক-শতক-সহস্রবারেরও বেশি।

(২)

বিবর্তনবাদ নিয়ে ছোটবেলা থেকেই নানা রোমহর্ষক গল্প শুনে এসেছি। জীবনে যেদিন প্রথম ডারউইনের বিবর্তনবাদের নাম শুনলাম সেদিন বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না, মানুষ-গরিলা-শিম্পাঞ্জী-বানর একই উৎস থেকে এসেছে? কী অবিশ্বাস্য!! পড়শি এক আত্মীয় বললেন, "**এ ঘোর কলিকালের আলামত!**" আমি তখন বুঝতামই না, কলিকাল কী, তাই হা করে তাকিয়ে ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। আমার মতো যারা মফস্বলে থাকেন, তারা ভালো করেই জানেন মফস্বলে বিবর্তনবাদ নিয়ে সঠিক তত্ত্ব জানার চেয়ে ডারউইনকে নিয়ে গালিগালাজই বেশি শুনা যায়। অনেকের মুখে এই ধরণের গালিগালাজ শুনে কাউকে কাউকে জিজ্ঞেস করে দেখেছি, তারা বিবর্তনবাদ কী সেটাই ভালো করে বলতে পারেন না? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা পর্যন্ত বিবর্তনবাদ নিয়ে ভয়ঙ্কর সব ধারণা পোষণ করেন। বাংলা ভাষায় ডারউইন সম্পর্কে জানার চেয়ে, মিথ্যে ভাষণে

ভরপুর এবং ডারউইনের পিতৃ-মাতৃকূল তুলে গালিই বেশি সবচেয়ে সহজে শুনা যায়, খুবই সস্তায় পাওয়া যায় ওগুলো!!

সত্যি বলতে, ছোটবেলায় বিবর্তনবাদ নিয়ে আমার মধ্যে তেমন একটা আগ্রহ ছিল না, বিস্তারিত জানার সুযোগ না থাকায় অনেকদিন এই তত্ত্বকে বিজ্ঞানসম্মত বলে মেনে নিতে পারিনি। আজ থেকে পনের-বিশ বছর আগে হয়তো ডারউইন সম্পর্কে শিশু পাঠ্যের কোন বই না থাকায় অথবা মফস্বলের আর্থ-সামাজিক কারণে আমাদের মতো অনেকেই বিবর্তনবাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। কিন্তু ভাবনার বিষয়, এই পনের-বিশ বছরে কী সময় এগিয়েছে? তা না হলে, আজও তো দেখি বিবর্তনবাদ এবং ডারউইনের বিরুদ্ধে হরহামেশাই কামান দাগানো হচ্ছে। ডারউইনকে অহরহ গালি-গালাজসহ প্রতিনিয়ত বিবর্তনবাদকে মিথ্যা প্রমানিত করার উদ্দেশ্যে, কথার ফুলঝুড়ি ছুটিয়ে বেড়ান অনেকে। এ ধরণের ঘটনা শুধু আমাদের পিছিয়ে পড়া কোন মফস্বলের ঘটনা নয়, সারা দেশেই একই অবস্থা। খোদ রাজধানীর স্কুল-কলেজে বিবর্তনবাদ পড়ানো হয় না, বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানের অনার্স কোর্সেও না, মাস্টার্সে খুবই ভাসা ভাসা করে শুধু পাস করে আসার জন্য পড়ানো হয়। বিজ্ঞান এড়িয়ে যাওয়ার এ ধরণের অপচেষ্টা শুধু আমাদের বাংলাদেশেই নয়, পশ্চিমের অনেক উন্নত দেশেও (আমেরিকা) এ (অপ)কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে। কিছু কিছু কূটকৌশলী পশ্চিমাবিজ্ঞরা আবার এক কাঠি সরেস! বিজ্ঞানের ক্লাসে সৃষ্টিতত্ত্ব (Intelligent Design বা আই.ডি) পড়ানোর জন্য কোমরে গামছা বেঁধে আন্দোলনে নেমে পড়েছেন! তবে আফসোসের খবর! ওনাদের ওই সাধের স্বপ্নে সরাসরি বাগড়া দিয়েছে আদালত। আদালত সাফ জানিয়ে দিয়েছে, আই.ডি কখনোই বিজ্ঞান নয়, তাই বিজ্ঞানের ক্লাসে এটা পড়ানোর প্রশ্নই আসে না। আদালতের এই রায়ে সৃষ্টিতত্ত্বের আগ্রাসন থেকে বিজ্ঞান হয়তো কিছুকাল নিরাপদ থাকবে, তবে আই.ডিওয়ালারা যে এতো সহজেই থেমে পড়বে, মাঠ থেকে কেটে পড়বে, এমনটা ভাবনার কোনো কারণ নেই; বরং নতুন ফন্দি-ফিকির করে আবারও মাঠ দখলের চেষ্টা চালাবে, নিশ্চিত।

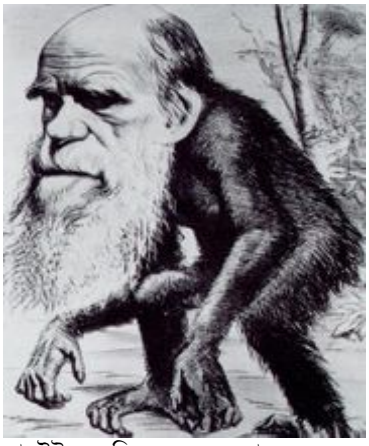
ডারউইনকে নিয়ে এমন ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন প্রচুর পাওয়া যায়

(৩)

এবার আমেরিকা ছেড়ে আমাদের বাংলাদেশে ফিরে আসি। ধরে নিলাম, বাংলাদেশে না হয় আফিমে আসক্ত শ্রেণীবিভক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ (মনীষী মার্কস বর্ণিত) এবং রক্তলোলুপ সওদাগরদের কারণে বিবর্তনবাদ পড়ানো হয় না, বিবর্তন সম্পর্কিত ভালো বই সবসময় পাওয়া যায় না। কিন্তু হায়! প্রবাসী উচ্চশিক্ষিত বাংলাদেশীরাও যে বিবর্তনবাদ নিয়ে এতো এলার্জিতে ভুগতেছেন, তা আগে জানা ছিল না! প্রবাসী বাংলাদেশীদের আন্তর্জালের কল্যাণে এ বিষয়টি জেনে বেশ কৌতুকবোধ করেছি। কিন্তু এটা জানি না, ওনারা কী বিবর্তনবাদ সম্পর্কে বিস্তৃত জেনেই এই ধরণের এলার্জিতে ভুগতেছেন নাকি না জেনেই এলার্জিতে ভুগতেছেন? মুক্তমনাতে বন্যাদির বিবর্তনবাদ নিয়ে লেখালেখি শুরু করার পর দেখি, কতিপয় বাংলা আন্তর্জাল লেখকের (ইচ্ছাকৃত কারণে নাম উল্লেখ করলাম না) রাতের ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছে। তারওপর বিবর্তনবাদ নিয়ে বন্যাদির লেখাগুলো নিয়ে "**বিবর্তনের পথ ধরে**" নামে বই বের হচ্ছে শুনে, ওনাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবার যোগাড়! এরমধ্যে কিছু কলমচি থুক্কু কি-বোর্ডচি নিজেদের নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছেন বিবর্তনবাদকে বিজ্ঞানের শাখা থেকে এক্কেবারে উৎখাত করে দেয়ার জন্য! কেন ভাই, বিবর্তনবাদকে নিয়ে কেন এতো ভয়? কী গজব লুকিয়ে আছে এর মধ্যে? ওনাদের আচরণ দেখে মনে হচ্ছে, বিবর্তনবাদ বাঙালিরা জানলে মহাসর্বনাশ হয়ে যাবে! (এটা কী সেই কথিত **সোস্যাল ডারউইনিজম** টিকিয়ে রাখার কৌশল? হা! হা!) একের পর এক উদ্দেশ্যবাদী, সৃষ্টিতত্ত্ববাদী বক্তব্য দিয়ে ডারউইনিজমের বিরুদ্ধে লম্ফজম্ফ শুরু করেছেন। অভিজিৎ রায়, বন্যা আহমেদ, বিপ্লব পালসহ আরো অনেকেই কষ্ট করে দীর্ঘ সময় ধরে ওঁদের বক্তব্যের (বিবর্তনবাদ বিরোধিতার) জবাব দিয়েছেন, তবু থামার লক্ষণ নেই। একই ধরণের বক্তব্য ভিন্ন ভিন্ন টাইটেল

দিয়ে কিছু দিন পরপর উপস্থাপন করে, সাধারণ পাঠকদের বিভ্রান্ত করার কৌশল অবলম্বন করে চলছেন। বেশ আগে শুনেছিলাম, কে যেন বলেছিলেন "একটি মিথ্যাকে দশবার বললে, মিথ্যা সত্য হয়ে যায়।" হয়তো সেই আকাঙ্ক্ষায় পথ চেয়ে আছেন ওনারা। এ দেখে আমার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতার কয়েকটি লাইন মনে পড়ছে -

'তোরে হেথায় করবে সবাই মানা।
হঠাৎ আলো দেখবে যখন
ভাববে, একি বিষম কান্ডখানা!
সংঘাতে তোর উঠবে ওরা রেগে,
শয়ন ছেড়ে আসবে ছুটে বেগে,
সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে
লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়।
আয় প্রচণ্ড, আয়রে আমার কাঁচা।'

রবী ঠাকুরের সেই কবেকার বাণী আজও কী ভয়ানকভাবে সত্য। বিবর্তনবাদের আলো চোখে পড়তেই *আশরাফুল মাকলুকাত*দের পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। টালমাটাল হয়ে পড়ছে ওনাদের বিশ্বাসের স্তম্ভগুলো। সৃষ্টিকর্তা বিলুপ্ত হয়ে যাবেন, এ ভাবনাতে সৃষ্টিকর্তা থেকে পাণ্ডাদেরই দুশ্চিন্তা বেশি!! কারণটা কী? ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, তথাকথিত সৃষ্টিকর্তার ধুয়ো তুলে পাণ্ডারাই যে নিজেদের আহার যোগাড় করেন; তাই বিবর্তনবাদের কথা সাধারণ জনগণ জেনে গেলে, পাণ্ডাদের রুটি-রুজির পথ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই যেভাবেই হোক, বিবর্তনবাদকে রুখতে হবে, বিজ্ঞানের নামে অপবিজ্ঞান দিয়েই হোক আর ধর্মীয় জিগির তুলেই হোক। এ শুধু আমাদের তৃতীয় বিশ্বের গরীব বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অবস্থা নয়, বিশ্বের দেশে দেশে যুগে যুগে পাণ্ডাদের দল এরকম করে আসছে আর তাদের সহায়তায় সদা প্রস্তুত আছে লাঠিয়াল বাহিনী নিয়ে সওদাগরের দল, গণ(!)মাধ্যম সহ আরো কত কী।

(৪)

এ বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত-সমালোচিত এবং কারো কারো কাছে বিতর্কিত বিজ্ঞানী রবার্ট চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২)। নিঃসংশয়ে বলা যায়, ডারউইন প্রদত্ত বিবর্তনবাদ তত্ত্বটি বিজ্ঞানের জগতে যতখানি আলোচনা-সমালোচনা-গুঞ্জন সৃষ্টি করেছে, তার শতকরা একভাগও অন্য কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এতো আগ্রহ-আলোচনা সৃষ্টি করতে পারেনি। কারণটা সমাজ সচেতন মানুষদের কাছে সহজেই অনুমেয়। মৃত্যুর একশ পঁচিশ বছর পরেও সারা পৃথিবীতে প্রত্যেক বছর ডারউইনকে নিয়ে অসংখ্যা বই লেখা হচ্ছে। এরমধ্যে বেশিরভাগই হচ্ছে ডারউইন কিংবা ডারউইন প্রদত্ত বিবর্তনবাদের বিপক্ষে। কিছু কিছু বই ডারউইন এবং বিবর্তনবাদের পক্ষে এবং এদের বেশিরভাগই সত্য জানা এবং জানানোর আন্তরিক প্রচেষ্টা থেকে রচিত। প্রাত্যহিক জীবন থেকে আমরা দেখেছি, এই বাংলাদেশে বিবর্তনবাদ নিয়ে আপামর জনগণের নানা সন্দেহ-সংশয় রয়েছে। বাংলা ভাষায় বিবর্তনবাদ নিয়ে খুব একটা বই বাজারে তেমন পাওয়া যায় না। আর যেগুলো আছে, সেগুলোর নতুন সংস্করণ অনেক দিন ধরেই বের হচ্ছে না। বিবর্তনবাদ সম্পর্কিত বাংলাভাষায় পশ্চিমবঙ্গ থেকেও কিছু বই এর মধ্যে বের হয়েছে তবে তার মধ্যে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত বেশি। তবু এর মধ্যে প্রকাশিত কিছু বইয়ের (কোনোক্রমেই পূর্ণাঙ্গ তালিকা নয়) হদিস দিলে মনে হয় বিবর্তনবাদে উৎসাহী সাধারণ পাঠকের ভালো হয়। বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত বিবর্তনের ওপর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হচ্ছে - ড. ম. আখতারুজ্জামানের (প্রফেসর, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) "**বিবর্তনবিদ্যা**"। বইটি বাংলা একাডেমী থেকে ১৯৯৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। ৫৩৬ পৃষ্ঠার এই বইটি বাংলা ভাষায় বিবর্তনের ওপর আকর গ্রন্থই বলা যায়। এই বইয়ে সতেরটি অধ্যায়ে বর্ণিত আছে বির্বতনের সংজ্ঞা, উৎপত্তির ধারণা, বিসৃষ্টিবাদ, বিবর্তনবাদের পটভূমি, ডারউইন-পূর্ববর্তী বিবর্তনবাদ, ডারউইনবাদ, বিবর্তনবাদী সংশ্লেষণ, বিবর্তনের সাক্ষ্য, বিবর্তন প্রক্রিয়া : বংশগতীয় ব্যাখ্যা, মানব বিবর্তন, মানব বিবর্তনের প্রসারিত ধারণা, জীবনের উৎপত্তি, জড়জগতে বিবর্তন ইত্যাদি। ড.

আখতারুজ্জামান অনুবাদ করেছেন (বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত) ডারউইনের বিখ্যাত "**প্রজাতির উৎপত্তি**" গ্রন্থটি। বাংলাদেশের বিখ্যাত নিসর্গবিদ, বহুমাত্রিক লেখক দ্বিজেন শর্মা কিশোর পাঠকের উদ্দেশ্যে ডারউইন ও বিবর্তনবাদ সম্পর্কিত তিনটি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেছেন; **চার্লস্ ডারউইন ও প্রজাতির উৎপত্তি** (সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭), **সতীর্থ বলয়ে ডারউইন** (মুক্তধারা, ১৯৯৯), **ডারউইন : বিগ্‌ল্-যাত্রীর ভ্রমণকথা** (সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৯)। প্রত্নজীববিদ্যা (Paleontology), নৃবিজ্ঞানের (Anthropology) পাঠ্য হিসেবে মোহাম্মদ শাহ আলম (সহযোগী অধ্যাপক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়) লিখেছেন "**সাধারণ প্রত্নজীববিদ্যা**" (বাংলা একাডেমী, ১৯৯০) এবং এবনে গোলাম সামাদ রচনা করেছেন "**নৃতত্ত্বের প্রথম পাঠ**" (অনন্যা প্রকাশনী, ২০০১)। এছাড়া বাংলা একাডেমীর বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক, বিখ্যাত বিজ্ঞান লেখক তপন চক্রবর্তীও কিশোর পাঠকের উদ্দেশ্যে সহজবোধ্য ভাষায় উপস্থাপন করেছেন "**কোথা থেকে কেমন করে এলাম**" (দীপ্র প্রকাশনী, ২০০৩)।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিবর্তনবাদ এবং ডারউইন নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বাংলাদেশে পাওয়া যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে - দুই খণ্ডে বাংলায় অনুবাদকৃত চার্লস ডারউইনের **অরিজিন অফ স্পিসিস** (ভাষান্তর - শান্তিরঞ্জন ঘোষ, দীপায়ন প্রকাশনী, ২০০১), চার খণ্ডে চার্লস ডারউইনের **ডিসেন্ট অফ ম্যান** (ভাষান্তর - অসীম চট্টোপাধ্যায়, দীপায়ন প্রকাশনী)। এছাড়া একই প্রকাশনী থেকে সহজবোধ্য ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে "**বনমানুষ থেকে মানুষ**" (২০০৩); লিখেছেন সলিল সাহা। শৈব্যা প্রকাশন থেকে শিশুপাঠ্যের জন্য বের হয়েছে সুশান্ত মজুমদার কর্তৃক "**চার্লস ডারউইন ও বিবর্তনবাদ**" (২০০৩)। নারায়ণ সেন লিখেছেন অসাধারণ এক গ্রন্থ "**ডারউইন থেকে ডিএনএ এবং চারশো কোটি বছর**" (আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৪)। অনন্য এ বইটি আমার মতো সাধারণ পাঠকগণের (প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী নন যারা) কাছে একটু জটিল মনে হলেও এতে বিজ্ঞান এবং ধ্রুপদী সাহিত্যের নান্দনিক মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন লেখক, সে কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ থেকে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে সুহিতা গুহের "**জীন, বংশধারা ও বিবর্তন**" (১৯৮৫, ১৯৮৬)। বইটি স্নাতক স্তরের জেনেটিক্স বিভাগের জন্য রচিত। এ বইয়ের প্রথম খণ্ডে আলোচিত হয়েছে মেণ্ডেলতত্ত্ব, জীন ইন্টারঅ্যাকশন, জীনের কার্যধারা, জেনেটিক কোড, সেক্স নির্ধারণ, মিউটেশন, ব্যকটেরিয়া ও ভাইরাসের জেনেটিক গঠন ও আচরণ, মানুষের জেনেটিক গঠন ও বংশগত চরিত্র, জীন ফ্রিকোয়েন্সি ইত্যাদি এবং দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচিত হয়েছে বিবর্তন, বিবর্তনের প্রমাণ, বিবর্তন সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ, প্রজাতির উৎপত্তি, অ্যাপোমিক্সিস, টিস্যু কালচার, উদ্ভিদ প্রজনন, উদ্ভিদ প্রজননের বিভিন্ন পদ্ধতি ইত্যাদি। যদিও এ বইটিতে সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় যথাসম্ভব সহজবোধ্য করে প্রত্যেকটি বিষয়ই এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, তবে বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের স্নাতক স্তরের পাঠ্যবই হওয়ার কারণে এই বইটি সাধারণ পাঠকদের বুঝতে উদ্ভিদবিদ্যা, জীববিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, অঙ্গসংস্থানবিদ্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নানা শাখার নূন্যতম জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তা বলাই বাহুল্য।

(৫)

আমাদের গোটা পৃথিবাটাই বিবর্তনের রাজ্য। শুধু আমাদের এ পৃথিবী কেন, এ বিশ্ব-মহাবিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সবকিছুই বিবর্তনের ফসল। বিবর্তনবাদ আজ কোনভাবেই অস্বীকার করা সম্ভব নয়। ইংরেজি "Evolution" শব্দকে কেউ কেউ "ক্রমবিকাশ" বলে অভিহিত করে থাকেন। তবে বহুল ব্যবহারের কারণে "বিবর্তন" শব্দটিই সকলের কাছেই পরিচিত। মজার ব্যাপার হচ্ছে, বিবর্তবাদের জনক হিসেবে পরিচিত রবার্ট চার্লস ডারউইন ১৮৫৯ সালে যখন "**প্রজাতির উৎপত্তি**" (ইংরেজিতে পুরো নাম হচ্ছে The Origin of Species by Means of Natural Selection, Or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life যার বাংলা করলে দাঁড়ায়- প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বা জীবন সংগ্রামে টিকে থাকা জাতি সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রজাতির উৎপত্তি) গ্রন্থটি প্রকাশ করেন, তখন অত্যন্ত সযত্নে মানুষের উদ্ভবের বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছিলেন। (এমন কী "বিবর্তন বা Evolution" পরিপদটি তিনি নিজে আবিষ্কার করেন নি বা কখনো ব্যবহার করেন নি! আধুনিক কালের বিখ্যাত বিবর্তনবাদী, হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্টেফেন জে. গোল্ড (Stephen Jay Gould : ১৯৪১-২০০২) বলেন, এ পরিপদটি বিবর্তনবাদের জনক ডারউইন, এমন কি লামার্ক বা হেকেল কেউই ব্যবহার করেন নি। ডারউইন বলেছিলেন "পরিবর্তনসহ উদ্ভব"

(Descent with modification), লামার্ক ব্যবহার করেছিলেন "রূপান্তর" (Transgormisme), হেকেলর ব্যবহৃত শব্দটি ছিল " ট্রান্সমিউটেশন-তত্ত্ব (Transmutation-theorie)"। অধ্যাপক গোল্ড মনে করেন, Evolution পরিপদটি সবপ্রথম ব্যবহার করেন জার্মান জীববিদ আলব্রেখট ফন হেলার (Albrecht Von Haller) ১৭৪৪ সালে। ডারউইন তাঁর প্রজাতির উৎপত্তি গ্রন্থের শেষ প্যারায় একবারই মাত্র Evolution পরিপদটি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু এই পরিপদ দিয়ে তিনি কখনও নিম্নস্থর থেকে উচ্চস্থর উন্নীত হওয়াকে বোঝান নি। তিনি বলেছেন, "ব্যাকটেরিয়া যেহেতু তার পরিবেশে চমৎকারভাবে অভিযোজন করে সেহেতু অন্য তথাকথিত উচ্চতর জীব থেকে একে নিম্নতর মনে ঠিক নয়। পূর্ববর্তী জীব থেকে ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীবের উৎপত্তিই বিবর্তনের মূল কথা।" এছাড়া অন্যান্য লেখক "Evolution" শব্দটি অন্য অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন, প্রাক-গঠন (Preformation) তত্ত্বের অনুসারী হেলার Evolution পরিপদটি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন ডিম্বানু বা শুক্রাণুতে বিদ্যমান "ক্ষুদে মানুষদের (Humunculi)" ভ্রূণে পরিণত হওয়া। তবে ১৬৪৭ সালে কবি এইচ মুর কবিতা লিখতে গিয়ে সর্বপ্রথম বর্তমান কালের অর্থে Evolution পরিপদটি ব্যবহার করেন। মুর তাঁর কবিতায় Evolution দিয়ে 'সুশৃঙ্খলভাবে ক্রমান্বয়ে একসারির ঘটনাবলীর আবির্ভাব' বুঝিয়েছিলেন। বর্তমানকালে খুব সাধারণভাবে 'বিবর্তন' বলতে তাইই বুঝায়। 'বিবর্তন' দ্বারা এখন প্রগতিশীল বিকাশের, সরল থেকে সুশৃঙ্খলভাবে জটিলের আগমন, অবিকশিত প্রাথমিক দশা থেকে পূর্ণবিকশিত বা পরিণত দশায় পৌঁছানো বোঝায়। এখানে কোনোভাবেই উচ্চ-নিম্ন মূল্যায়ন করা হয় না।) ধারণা করা হয়, তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আর চার্চের কড়া নজরদারির কারণে ডারউইন খ্রিষ্টধর্মগ্রন্থ বাইবেলের বক্তব্যের বাইরে গিয়ে মানুষের উৎপত্তি নিয়ে বৈজ্ঞানিক মত প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হয়েছিলেন। ডারউইনের চোখের সামনেই তো ব্রুনো, গ্যালিলিওর করুণ দুর্দশার উদাহরণ ছিল। তবুও এই বইয়ের শেষ অধ্যায়ে এমন দু-একটি মন্তব্য করেছিলেন, যা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয়, তিনি মনে করতেন মানুষের ইতিহাসও অন্য প্রজাতিদের থেকে ভিন্ন নয়। গ্রন্থের একদম শেষে একটু ঘুরিয়ে বলেছেন, তাঁর বিবর্তনের ধারণার মধ্যে মানুষও অন্তর্গত : "Thus, from the war of nature, from famine and death, the most exalted object which we are capable of conceiving, namely, the production of the higher animals, directly follows. There is grandeur in this view of life, with its several powers, having been originally breathed by the Creator into a few forms or into one; and that, whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning endless forms most beautiful and most wonderful have been, and are being evolved." (সূত্র : The Origin of Species by Means of Natural Selection, Or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life; **Charles Darwin**)।

যা হোক, আমি এখানে খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে সাধারণ ভাষায় ডারউইনের "প্রজাতির উৎপত্তি" গ্রন্থের মূল বক্তব্য আলোচনা করব। ডারউইন মূলত তিনটি বক্তব্য প্রদান করেছিলেন :

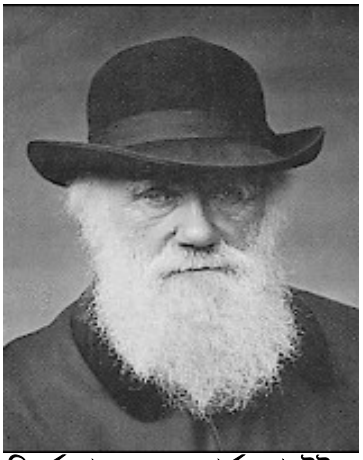
বিবর্তনবাদের জনক চার্ল্‌স্ ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২)

(**এক**) প্রতিটি জীবই অন্য জীব থেকে (চেহারা, আকার) ভিন্ন। মানুষ, বানর, শিম্পাঞ্জি, গরিলার দেহের গড়ন প্রায় একই ধাঁচের, কিন্তু সহজেই এদের আলাদা সনাক্ত করা যায়। যেমন আলাদা করে চেনা যায় গরু, মহিষ, হরিণকে; সাপ, কুমির, গুঁইসাপকে। আবার মানুষে মানুষে কত তথাৎ। মানুষে মানুষে গায়ের রঙ, উচ্চতা, চেহারা, রুচি ইত্যাদিতে প্রচুর তফাৎ। প্রাণীদের মধ্যে এই তফাৎ, ভিন্নতা বা বিবিধায়ন (Variation) ঘটে প্রাণীর অবস্থানগত আবহাওয়া, জলবায়ু, ভূমিরূপ ও খাদ্যের কারণে। একটু খেয়াল করলে দেখা যায়, নিরক্ষীয় গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের মানুষের দেহের বর্ণ কালো, শীতপ্রধান অঞ্চলে সাদা বর্ণের মানুষ আর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে তামাটে বর্ণের মানুষ। উচ্চভূমি পাহাড় অঞ্চলের মানুষের চেহারা আর সমতলভূমির মানুষের চেহারা আকারগত দিক দিয়ে অনেক পৃথক। প্রচুর এবং পুষ্টিকর খাদ্যের

যোগান মানুষকে কীরকম সতেজ এবং কর্মঠ রাখে তা আমরা সবাই জানি। এসব কথা অন্যান্য প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদজগৎ সম্পর্কেও খাটে।

(দুই) ডারউইন বলেছেন,"জীব গাণিতিকহারে তার বংশ বৃদ্ধি করে। অর্থাৎ দু' থেকে চার, চার থেকে আট, আট থেকে ষোল, ষোল থেকে বত্রিশ ... এভাবে জীবের বংশবৃদ্ধি ঘটছে।" অবাক ব্যাপার, এতে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয় না। প্রকৃতিতে সব জীবের সংখ্যা মোটামুটি একটা স্থিতাবস্থায় আছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, এক মৌসুমে একটি স্যামন মাছ ২৮ লক্ষ ডিম পাড়ে। একটি ওয়েস্টার পাড়ে ১৪ লক্ষ ডিম। গোলকৃমি একদিনে পরীক্ষাগারে ৭০ লক্ষ ডিম দেয়। আবার তারা মাছের কথা ধরা যাক (এদের নাম তারা মাছে হলেও, এরা মাছ নয়। এটি অমেরুদন্ডী প্রাণী)। ৫০টি স্ত্রী তারা মাছ আনুমানিক ৫০ লক্ষ তারা মাছের জন্ম দেয়। অর্থাৎ একটি স্ত্রী তারা মাছ জন্ম দেয় আনুমানিক ১ লক্ষ তারা মাছ। এখন যদি, এই লক্ষের মধ্যে অর্ধেক স্ত্রী জাতীয় হয় তবে এরা এভাবে কয়েক প্রজন্ম যদি সন্তান উৎপাদন করে চলে এবং মরে না যায় তাহলে পৃথিবীর জলভাগ শুধু তারামাছেই ভরে যাবে। উপরন্তু আক্রমণ করবে ভূ-ভাগকে। একটু হিসেব করলে দেখা যায়, তারা মাছের মাত্র পনের বংশধর যদি এভাবে টিকে থাকতে পারে, তবে পৃথিবীর মোট ধূলিকণা থেকে ওদের সংখ্যা বেশি হয়ে যাবে! আবার সামান্য এক জোড়া সাধারণ মাছির সব বংশধরেরা বেঁচে থেকে নতুন বংশধর তৈরী করে যেতে পারলে, মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যেই এদের সংখ্যা ১৯১,০১০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০-তে পৌঁছে যাবে। এতক্ষণ, যারা বেশি ডিম পাড়ে বা বেশী সন্তান দেয় তাদের মাত্র কয়েকটির উদাহরণ দেয়া হলো। এবার কম ডিম পাড়ে বা সন্তান উৎপাদন কম করে এমন কয়টি প্রাণীর কথা বলা যাক। পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট মাছ ফিলিপাইনের গোবি বছরে মাত্র ৪০টি ডিম দেয়। ব্যাঙ (Bull Frog) বছরে ২০,০০০ ডিম পাড়ে। অন্যান্য ব্যাঙ বছরে দেয় এক হাজার ডিম। আবার কম সন্তান উৎপাদনের উদাহরণ হিসেবে ডারউইন তাঁর "প্রজাতির উৎপত্তি" গ্রন্থে হাতির উদাহরণ টেনেছেন। হাতি প্রায় একশ বছর বাঁচে। ত্রিশ থেকে নব্বই বছর পর্যন্ত ওরা সন্তান উৎপাদন করতে পারে। একটি মাদি হাতি সারা জীবনে ছয়টির বেশি সন্তান জন্ম দিতে পারে না। হিসেব করে দেখা গেছে, যদি সমস্ত হাতির সফলভাবে সমস্ত বংশরক্ষা করা যায়, এক জোড়া হাতি থেকে ৭৪০-৭৫০ বছরে হাতির জনসংখ্যা ১ কোটি ৯০ লক্ষ-তে গিয়ে দাঁড়াবে! উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এরূপ সংখ্যাবৃদ্ধির সমস্যা আরো বেশি। এক একটি গাছ কতো লক্ষ লক্ষ বীজ জন্ম দেয় প্রতি মৌসুমে!

(তিন) জীবের সংখ্যা বৃদ্ধির এ হার সত্ত্বেও প্রতি ধরণের জীব প্রকৃতিতে প্রায় একই সংখ্যায় থাকে। এর কারণ হলো সংগ্রাম। অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম (Struggle for existence)। জীব প্রতি মুহূর্ত লড়াই করছে পরিবেশের সাথে, নিজের ধরণের জীবের সাথে। যেমন : বাঘ - হরিণ, মানুষ, ছাগল, গরু খায়। সাপ - ব্যাঙ, মাছ, সাপ, পাখি খায়। পাখি - সাপ, কেঁচো, ফড়িং, ব্যাঙ, ফল খায়। মানুষ - মাছ, পাখি, গরু, ছাগল, শাক-সব্জি ইত্যাদি খায়। একইভাবে প্রতিটি প্রাণী, উদ্ভিদ ঝড়, বন্যা, তুষারপাত, বৃষ্টি, তাপ, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, রোগ-মহামারীর সাথে লড়াই করে চলছে। এ লড়াইয়ে যারা টিকে থাকছে, তাদের মধ্য থেকে নতুন আঙ্গিকের জীবের জন্ম হচ্ছে। টিকে থাকা সবল প্রাণী থেকে আরো সবল প্রাণীর আবির্ভাব ঘটছে এবং এবং দুর্বল থেকে আরো দুর্বল প্রজাতি। এবং একসময় দুর্বল প্রাণী বা উদ্ভিদ অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে টিকে থাকতে না পারে এই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এরকম বহু লক্ষ লক্ষ উদ্ভিদ-প্রাণী এই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে ইতিহাসের অন্তরালে আশ্রয় নিয়েছে। ডারউইন আরো বলেছেন, পরিবেশ ও নিজ প্রজাতির সাথে লড়াইয়ে যারা টিকে গেল তাকে প্রকৃতির নির্বাচিত জীব বলে ধরে নেয়া যায় বা সংক্ষেপে প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) বলা যায়। প্রকৃতিতে যে সমস্ত কারণে এই লাগামছাড়া বংশবৃদ্ধি হার সংকুচিত হয়, তার মধ্যে ডারউইন খাদ্যসংকট, অন্যকোনো ভক্ষক দ্বারা সংহৃত হওয়া, আবহাওয়া, ভূ-প্রকৃতিগত জলবায়ুর পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়গুলো চিহ্নিত করেছেন। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রদান করেছেন আবহাওয়ার পরিবর্তনকে। ডারউইন মনে করেছিলেন, আবহাওয়া দু'ভাবে প্রজাতির হারকে সংকুচিত করতে পারে। প্রথমত : চরম আবহাওয়ার প্রকোপে বহু জীবের মৃত্যু হয়। ডারউইন নিজেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন, ১৮৫৪-৫৫ সালের শীতের মৌসুমে তাঁর বাগানের ৮০ শতাংশ পাখির মৃত্যু ঘটেছিল। দ্বিতীয়ত : আবহাওয়ার খামখেয়ালীপনায় খাদ্যের জোগানে টান পড়তে পারে। তখন বহু প্রাণীর মৃত্যু ঘটে।

আমরা সবাই বুঝি, খাদ্যের জোগানে টান পড়লে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে (Struggle for existence) যে কোন প্রজাতিই অবতীর্ণ হতে পারে। কিন্তু ডারউইন এতো সাদামাটা ভাষায় 'অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম' ধারণাটিকে বর্ণনা করেননি। তিনি এক ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করেছেন। তাঁর মতে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম সফল হওয়ার অর্থ শুধু নিজে বেঁচে থাকা নয়, সফলভাবে বংশরক্ষা করতে পারাটাও জরুরী। তাই অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম যেকোন ভাবে একটি প্রজাতিকে চ্যালেঞ্জের মধ্যে ছুঁড়ে দিতে পারে। যেমন, মরুভূমি অঞ্চলে দেহে সফলভাবে জলীয় পদার্থ সংরক্ষণও উদ্ভিদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের লক্ষ্য হতে পারে। আবার যেসকল উদ্ভিদ তার বংশবিস্তারের জন্য পাখির ফল খাওয়ার নির্ভর করতে হয়, সে ক্ষেত্রে অন্য উদ্ভিদদের পেছনে ফেলে পাখিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ক্ষমতা ওপর ঐ উদ্ভিদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নটি জড়িয়ে থাকে। সাধারণ ভাবে প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামকে তিনটি ধারায় বিভক্ত করা যায়। প্রথম হচ্ছে, আন্তপ্রজাতির মধ্যেকার সংগ্রাম, দ্বিতীয় হচ্ছে, একই এলাকায় বা পরিবেশে বসবাসকারী বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যেকার সংগ্রাম এবং তৃতীয় হচ্ছে জীবনধারণের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সংগ্রাম। ডারউইন বলেছেন, এই তিন ধরণের সংগ্রামের মধ্যে সবচেয়ে তীব্রতম সংগ্রাম হচ্ছে একই প্রজাতির মধ্যেকার বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যেকার লড়াই এবং প্রজাতির রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় এটি সবচেয়ে গুরুপূর্ণ। তিনি বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, যেহেতু একই গণের (Genus) অন্তর্ভুক্ত প্রজাতিরা সাধারণতঃ একই অর্থনৈতিক খোপে অবস্থান করে, তাই এই ধরণের দুটি প্রজাতির সদস্যের মধ্যেকার সংগ্রাম, দুটি ভিন্ন গণের প্রজাতির মধ্যেকার সংগ্রাম অপেক্ষা তীব্রতর।

এই যে বেঁচে থাকার জন্য লড়াই বা যুদ্ধ (যুদ্ধ বলতেই আমরা প্রচলিত অর্থে হাতিয়ার বা অস্ত্র-শস্ত্রের লড়াই বুঝি। এখানে তা নয়। বেঁচে থাকার তাগিদে, খিদের তাড়নায়, বাসস্থানের আশ্রয় লাভের জন্য, প্রজাতি টিকিয়ে রাখার স্বার্থে স্ত্রী জাতীয় প্রাণীর ওপর অধিকার আদায়ের জন্য এ জন্য লড়াই আপনা-আপনিই হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসেবে আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের কথ ধরা যাক। আমরা পেট ভরানোর জন্য শাক-সবজি, চাল, ডাল, মাছ, মুরগি ইত্যাদি নানা মাংস খাই। এটা বিলাসিতা নয়, হিংসা নয়, ইচ্ছা করে নয়। প্রয়োজনের কারণে এদের হত্যা করা হয়। আমাদের মতো আর সকল প্রাণীরই প্রাণ আছে, অনুভূতি আছে। তবুও আমরা বেঁচে থাকার তাগিদে এরকম করে আসছি। এইরকম অন্য প্রাণীরাও করে আসছে বেঁচে থাকার তাগিদে।), এ এক অঘোষিত যুদ্ধ। এ যুদ্ধ নিত্য নতুন সৃষ্টির যুদ্ধ। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে প্রতিটি জীবকেই নিত্য নতুন কায়দা বের করে নিতে হয়। এর মাধ্যমেই টিকে থাকার পথ বের করে নেয়। ইংরেজ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসার এই অভূতপূর্ব লড়াইকে "**যোগ্যতমের উদ্বর্তন**" (Survival of the fittest) বলে নামকরণ করেছেন। অর্থাৎ এই বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতায় যে টিকে গেল সে কোনো না কোনভাবে যোগ্য বটে।

ডারউইন '**প্রাকৃতিক নির্বাচন**', '**জীবের গাণিতিক হারে বংশবৃদ্ধি**' ও '**অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম**' প্রভৃতি তত্ত্ব মানুষের ক্ষেত্রে কতখানি প্রযোজ্য, তা নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, মানুষ এ নিয়ে বিস্তর আগ্রহ দেখাবে। তাঁর বিরোধিরাও এ বিষয়টিকে তাদের বিতর্কের প্রধান বিষয় হিসেবে গ্রহণ করবে। হয়েছেও তাই। আজো ডারউইনের মৃত্যুর একশ পঁচিশ বছর পরও অনেক উচ্চ শিক্ষিত থেকে শুরু করে সাধারণ খেটে খাওয়া জনগণ ডারউইনের বিবর্তনবাদের বিরোধিতা করে চলছেন। বিজ্ঞানের প্রমাণিত সত্যকে আপ্তবাক্য আর গায়েবী তন্ত্র-মন্ত্র দিয়ে যেনতেন প্রকারে অস্বীকার করার (কু)প্রচেষ্টা চলে আসছে। কিন্তু ভাববাদীদের জন্য আফসোসের ব্যাপার, বিজ্ঞান কোনো আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করে না, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিন্দুমাত্র মূল্য নেই। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় শুধু মূল্য দেয়া হয় নির্মোহ দৃষ্টিতে সত্যানুসন্ধানে ওপর।

সবাইকে ডারউইন দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা।